॥ গল্প থেকে নাটক :- 'নুটু মোক্তারের সওয়াল' গল্প থেকে 'দুই পুরুষ' নাটক ॥

(এক)

তারাশংকরের 'নুটু মোক্তারের সওয়াল' একটি চরিত্র-প্রধান গল্প। সুনির্বাচিত ঘটনা ও পরিস্থিতির সাহায্যে নুটু মোক্তারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন, আদর্শবাদী চরিত্রটিকে আলোকিত করা হয়েছে। চরিত্রের গল্প রচনার দিকে তারাশংকরের বিশেষ ঝোঁক ছিল। তাঁর বেশ ক'টি বিখ্যাত গল্পই চরিত্রের গল্প। চরিত্রের গল্প লেখার কৌশল সম্পর্কে Stevenson পরামর্শ দিয়েছিলেন — "You may take a character and choose incidents and situations to develop it, ..."[১] চরিত্রপ্রধান গল্পে একটি কেন্দ্রীয় চরিত্রের আদর্শ থাকে, সেই চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার জন্য যেটুকু ঘটনা বা প্লটের প্রয়োজন, শুধু সেটুকুই থাকে। বর্তমান গল্পেও তাই রয়েছে।

শিক্ষকতার আদর্শ স্থাপনের জন্যে নুটুবাবু প্রথম জীবনে শিক্ষকতার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। পিতামহ ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। অপ্রিয় সত্যভাষণে তিনি নির্দ্বিধ। এ-বিষয়েও তিনি পিতামহের সুযোগ্য উত্তরসূরী। ধনী জমিদারের দাম্ভিকতা তাঁকে পীড়িত করে। ধনীগৃহে নিমন্ত্রিত হ'য়ে তাঁর স্ত্রী অপমানিতা হ'য়ে ফিরে এলেন। এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য নুটুবাবু শিক্ষকতা ছেড়ে মোক্তারি পাশ ক'রে আদালতে প্র্যাকটিস শুরু করলেন। কঞ্চণার জমিদাররাই তাঁর প্রধান শত্রু। কঞ্চণায় নাকি লক্ষ্মী বাঁধা আছেন। তাঁর বিরোধ ঐ লক্ষ্মীর সঙ্গে। লক্ষ্মীর অভ্যাস হ'ল লোকের মাথার ওপর পা দিয়ে চলা। নুটুবাবুর সংকল্প — লক্ষ্মীর পা দু'টি তিনি ধুলোয় নামিয়ে দেবেন। গল্পে নাটকীয় দ্বন্দ্ব শুরু হ'ল।

ধীরে ধীরে দ্বন্দ্বের তীব্রতা বাড়ল। নুটু মোক্তারের জমিজমা ভাগে চাষ করায় মহাজারত মোড়লের ওপর কঞ্চণার জমিদাররা অত্যাচার শুরু করলেন। কঞ্চণার জমিদারদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করলেন নুটু মোক্তার। তাঁর অকাট্য যুক্তিতে জমিদারের দরিদ্রনির্যাতন প্রমাণিত হ'ল। জমিদারের গোমস্তা ও চাপরাশির কঠিন দণ্ডবিধান হ'ল। কিন্তু জজ আদালতের আপীলে মামলা ডিসমিস হ'য়ে গেল। উকিলের অপদার্থতায় হার হ'ল নুটু মোক্তারের। তিনি স্থির করলেন, ওকালতি পাশ ক'রে এর প্রতিকার করবেন। তিন বছর লাগল। ততদিনে মহাজারত জমিদারের অত্যাচারে সর্বস্বান্ত হয়েছে। আগুন দিয়ে তার ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। নুটুবাবু মহাজারতকে সঙ্গে নিয়ে উকিলের বেশে আদালতে ঢুকলেন। সওয়ালের সময় তাঁর অগ্নিবর্ষী ভাষণে দুর্বলের ওপর প্রবলের অত্যাচারের চিত্র উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। অপরাধীর কঠিন দণ্ড হ'ল।

নুটুবাবুর পসার দিন দিন বাড়তে লাগল। যে বিত্তশালী সমাজের বিরুদ্ধে নুটুবাবুর আক্রোশ ছিল, ধীরে ধীরে তিনি তাদেরই দলভুক্ত হলেন। দ্বন্দ্বের তীব্রতা কমে এল। গোত্রচরিত নুটুবাবুর সঙ্গে কঞ্চণার বাবুদেরও বিরোধের অবসান হ'ল। কঞ্চণার বড়বাবু নিজে উপযাচক হ'য়ে তাঁর নাতনীর সঙ্গে নুটুবাবুর বড় ছেলের বিয়ের প্রস্তাব করলেন। নুটুবাবু সানন্দে সম্মতি দিলেন। অর্থাৎ এখন তাঁর আত্মীয়তা ধনীর সঙ্গেই। দরিদ্র আত্মীয়দের তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। বিবাহপর্ব মিটে যাবার পর তাদের তিনি বিদায় দিতে ব্যগ্র হ'য়ে উঠলেন।

পরিবর্তনই জীবনের ধর্ম। নুটুবাবুর অজ্ঞাতসারেই তাঁর পরিবর্তন ঘটছিল। চেতনা ফিরে এল বৃদ্ধ মুন্সেফবাবুর চিঠি পড়ে। মুন্সেফবাবু লিখেছিলেন—"একদিন আপনি বলেছিলেন, মা লক্ষ্মীর অভ্যেস হল লোকের মাথার ওপর দিয়ে পথ করে চলা। তাঁর চরণ দুখানি আপনি পথের ধুলোয় নামাব বলেছিলেন। কিন্তু টেনে টেনে নিজের মাথাতেই চাপালেন যে!" চিঠির কথাগুলি 'তীরের মতো তাঁহার মস্তিষ্কে গিয়া বিঁধিল।' একটি অদ্ভুত নাটকীয় মুহূর্ত এল তাঁর জীবনে। সেই

মুহূর্তে মনে হ'ল — 'এই ঘর এই ঐশ্বর্য সমস্ত যেন কুৎসিত ব্যঙ্গে হিহি করিয়া হাসিতেছে।' বিশ্বস্ত মহাভারতও তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিল। নুটুবাবুর শ্বাস যেন রুদ্ধ হ'য়ে আসছিল।" বিহ্বল দৃষ্টিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার দরজাটা খুঁজিতেছিলেন, কিন্তু কই, দরজা কই ?" গল্পটি এইভাবে ব্যঞ্জনাগর্ভ সাংকেতিক পরিসমাপ্তি লাভ করেছে।

সমারসেট মম্ ছোটগল্পের নাটকীয় ঐক্যবন্ধনের কথা বলেছেন [২]। বর্তমান গল্পে অপ্রয়োজনীয় অংশকে বর্জন ক'রে একটি চরিত্রের বিবর্তনকে নাটকীয় ঐক্যসূত্রে গাঁথা হয়েছে। ছোটগল্পের সংহতিগুণ ও গাঢ়বন্ধতা এখানে অক্ষুণ্ণ। অনাবশ্যককে বর্জন করায় গল্পটি নাটকীয় দ্রুতগতি লাভ করেছে। নুটু মোক্তারের সওয়ালের মধ্যেও নাটকীয়তা আছে। তাছাড়া, গল্পটির সমাপ্তিও যথেষ্ট নাটকীয়। গল্পটিতে যথেষ্ট নাটকীয় উপাদান থাকায় লেখক সহজে গল্পটিকে নাটকে রূপান্তরিত করতে পেরেছেন। জীবনের নাটকীয় বিকাশ ও বিবর্তনের দিকে তারাশংকরের স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল।

(দুই)

তারাশংকরের 'দুই পুরুষ' নাটকের বীজগল্প 'নুটু মোক্তারের সওয়াল' ১৩৪৪ সালের ভাদ্র মাসের 'প্রবাসী'-তে প্রকাশিত হয়। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তারাশংকর সাহিত্য-জীবনকে বেছে নিয়েছিলেন পাকাপাকিভাবে এবং দক্ষিণ কলকাতার মনোহরপুকুর সেকেন্ড লেন্-এ একটি পাকা দেওয়াল টিনের ছাউনি দেয়া ঘর ভাড়া করলেন। এই ঘরটিতে কাটিয়েছিলেন প্রায় দেড় বছর। এরই মধ্যে অনেকগুলি ভালো গল্প ও একটি উপন্যাস লিখেছিলেন। আত্মকথায় লেখক বলেছেন : "এই সময় আরো একটি গল্প লিখেছিলাম 'নুটু মোক্তারের সওয়াল' — 'দুই পুরুষে'র বীজ।" [৩]

"তারাশঙ্কর তাঁর দেখা মানুষ ও পরিবেশকে প্রায় সরাসরি সাহিত্যে রূপ দিতে চাইতেন। এ তাঁর এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।"[৪] 'নুটু মোক্তারের সওয়াল' গল্পের বেশ ক'টি ঘটনা ও নুটু মোক্তারের চরিত্রটি কাল্পনিক নয়। এ সম্পর্কে লেখক আত্মকথায় বলেছেন —

"নুটু মোক্তার কল্পনার মানুষ নয়, সত্যকারের মানুষ। রামপুরহাট সাব-ডিভিশনের লোক। প্রথমে ছিলেন ইস্কুল-মাস্টার, তারপর হয়েছিলেন মোক্তার। সে আমলের বিচিত্র স্পষ্টবাদী মানুষ ছিলেন। তাঁর স্পষ্টবাদিতার অনেক গল্প আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। তার মধ্যে বাবুদের বাড়িতে নেমন্তন্নে মাছ কম দেবার গল্প, নীচে খেতে দেওয়ার গল্পটি অন্যতম।"[৫]

দীর্ঘ প্রায় পাঁচ বছর পর তারাশংকর গল্পটিকে নাট্যরূপ দেন। নাটকটির ভূমিকায় তারাশংকর লিখেছেন :

"'দুই পুরুষ' আমার দ্বিতীয় নাটক। আমার প্রথম নাটক 'কালিন্দী'। কিন্তু 'কালিন্দী' মূলত উপন্যাস। এই হিসাবে 'দুই পুরুষ'-কে আমার প্রথম নাটক বলিলেও ভুল হইবে না। 'দুই পুরুষ' রচনাকালে নাম দিয়াছিলাম 'পিতা-পুত্র' এবং ওই নামেই 'শনিবারের চিঠি'-তে প্রকাশিত হইতে থাকে; সঙ্গে সঙ্গে বইখানি ছাপাও আরম্ভ হয়। ইতিমধ্যে সুপ্রসিদ্ধ রঙ্গালয় 'নাট্যভারতী' কর্তৃপক্ষ বইখানি শুনিয়া মঞ্চস্থ করিবার অভিপ্রায়ে 'দুই পুরুষ' নামে বইখানিকে গ্রহণ করেন।"[৬]

গ্রন্থাকারে 'দুই পুরুষ' প্রকাশিত হয় ১৩৪১ সনের আষাঢ় মাসে। নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় নাট্যভারতী রঙ্গমঞ্চে ১৩৪১ সনের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ। দেশের তখন এক ক্রান্তিলগ্ন —

"দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যাহ্নে জাপান যখন পার্ল হারবার আক্রমণ করেছে এবং সরাসরি যুদ্ধে নেমে পড়েছে — সে সময় মঞ্চস্থ হয় 'দুই পুরুষ'। সেই

সময় দেশের ভয়ানক দুর্দিনেও মঞ্চসফল নাটক হিসেবে মঞ্চপ্রেমিক জনসাধারণের অভিনন্দনে নাটক ও নাট্যকার উভয়েই অভিনন্দিত হন।" [৭]

নাট্যভারতীতে প্রথম দিনের অভিনয়ের ভূমিকালিপি ছিল — নুটু মোক্তারের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস, বড়োবাবু-যোগেশ চৌধুরী, গোপী মিত্তির — নরেশ মিত্র, সুশোভন — জহর গাঙ্গুলী, মহাভারত — রবি রায়, বিমলা — শ্রীমতী প্রভা। যুগ্ম পরিচালক — নরেশ মিত্র ও সতু সেন।

প্রথম অভিনয়েই 'দুই পুরুষ' দর্শকচিত্ত জয় করল। বিশেষত নুটু মোক্তারের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাসের অভিনয় ছিল অনবদ্য ও ঐতিহাসিক —। প্রসঙ্গত স্মরণীয় নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্তের স্মৃতিচারণ —

"ছবিদার মৃত্যুর দিন সন্ধ্যায় (তারাশংকর) স্টার থিয়েটারে মালা নিয়ে এলেন। বল্লেন — 'আমার নুটবিহারীকে মালা পরাবো বলে তোর এখানে চলে এলাম।' ..... তারপর অভিনয় শিল্পে ছবিদার কীর্তি ও কৃতিত্ব নিয়ে সেদিন কত কথাই না বলেছিলেন।" [৮]

'দুই পুরুষে'-র পর তারাশংকর আরো ক'টি নাটক লিখেছেন। কিন্তু 'দুই পুরুষে'র মতো মঞ্চসাফল্য তাঁর অন্য কোনো নাটক লাভ করেনি।' এই নাটকটি নাট্যকার হিসেবে তাঁকে খ্যাতির তুঙ্গশিখরে পৌঁছে দিল। স্মৃতিকথায় তারাশংকর লিখেছেন —

"আমি দেখতে পাচ্ছি, আমার সম্মুখে প্রসারিত পথ। কাগজে কাগজে 'দুই পুরুষে'-র অকুণ্ঠিত প্রশংসা বেরিয়েছে। ..... কাগজে সংবাদ পাচ্ছি, লোকমুখেও সংবাদ পাচ্ছি, বন্ধুবান্ধবদের চিঠি পাচ্ছি, পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে করতালি-মুখরতার মধ্যে নাটক অভিনয় হচ্ছে।" [৯]

সাহিত্য-জীবনে যে প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি তিনি অর্জন করেছেন তাতে রঙ্গ-মঞ্চের ভূমিকার কথা তিনি সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করেছেন, "আমার সাহিত্যিক-জীবনে এই রঙ্গমঞ্চের সাহায্য পরিমাণে সামান্য হ'লেও দুঃসময়ের পাওনা হিসাবে অসামান্য। সেদিন রঙ্গমঞ্চের এই সাহায্য না পেলে সাধনার অকৃত্রিম নিষ্ঠা সত্ত্বেও আমার জীবনে এই সাফল্য অর্জন সম্ভবপর হ'ত না। শুধু আর্থিক সাহায্যই করে না রঙ্গমঞ্চ, নাট্যকার হিসেবে আমার খ্যাতিকে ত্বরিত গতিতে বিস্তৃত করেছিল।"[১০] 'দুই পুরুষে'র মঞ্চসফল অভিনয়ই তারাশংকরের নাট্যকার-খ্যাতিকে দিগন্ত-বিস্তৃত করেছিল।

(তিন)

আগেই বলা হয়েছে যে 'দুই পুরুষ' নাটকের আদি বীজ রয়েছে 'নুটু মোক্তারের সওয়াল' গল্পে। কিন্তু দীর্ঘ প্রায় পাঁচ বছর পর যখন তিনি গল্পটিকে নাটকে রূপান্তরিত করলেন তখন ঘটনাগ্রহনে, চরিত্রচিত্রনে, জীবনদর্শনে, পরিস্থিতি-রচনায় এবং শেষত পরিণতিতে বেশ খানিকটা পার্থক্য দেখা গেল।

(ক) গল্পের প্লট ছিল সরল, সেখানে কোনো জটিলতা ছিল না। নাটকীয় ঐক্য (dramatic unity) ছিল অক্ষুণ্ণ। অত্যাচারী জমিদারদের সঙ্গে নুটু মোক্তারের দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র ক'রে গল্পের সংহত ও ঘনবদ্ধ অবয়বটি গড়ে উঠেছিল। সুনির্বাচিত ঘটনা, চরিত্র ও পরিস্থিতির সুচারু বিন্যাসে গল্পটি একমুখী পরিণতিতে পৌঁছেছিল।

নাটকে প্লট হয়েছে জটিল। কল্যাণী-নুটুবিহারী-বিমলা-র ত্রিভুজ প্লটে জটিলতার মাত্রা যোগ করেছে। অরুণ-মমতার সম্পর্ক নিয়েও খানিকটা জটিলতা সৃষ্ট হয়েছে। নাটকের শেষ পর্যায়ে

পিতাপুত্রের বিরোধকে কেন্দ্র ক'রে নতুন দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। গল্পে এসবের ছায়ামাত্র ছিল না।

(খ) নাট্য-রূপান্তরে কাহিনী যেমন ডালপালা ছড়িয়েছে নানাদিকে, নতুন নতুন চরিত্রেরও তেমনি আগমন ঘটেছে। যেমন, কল্যাণী, সুশোভন, মমতা, অরুণ, বরুণ, শ্যামা প্রভৃতি চরিত্র গল্পে ছিল না, অথচ নাটকে এরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়া, নাটকীয় প্রয়োজনে বেশ কিছু পার্শ্বচরিত্র গড়ে উঠেছে যারা গল্পে ছিল অনুপস্থিত। আবার কোনো চরিত্র গল্প থেকে নাটকে অনেকটাই বদলে গেছে। যেমন, গল্পের বৃদ্ধ মুন্সেফবাবু নাটকে নুটুবিহারীর বন্ধু কমলাপদে রূপান্তরিত। কোনো কোনো চরিত্র, যারা গল্পে ছিল নামরূপহীন তারা নাটকে নামরূপ পরিগ্রহ করেছে। গল্পের নামহীন জমিদাররা তাই নাটকে শিবনারায়ণ-দেবনারায়ণ, নুটুর স্ত্রীর নাম নাটকে বিমলা, গল্পের নুটুর নামহীন পুত্রকন্যারা নাটকে অরুণ-বরুণ-শ্যামা। গল্পে মহাভারতের ঘরে আগুন লাগিয়েছিল এক 'দীর্ঘকায় কালো জোয়ান' নাটকে সে কালী বাব্দী। এই চরিত্রগুলির শুধু নামই নাটকে সংযোজিত হয় নি, তাদের ক্রিয়াও নাটকীয় কাহিনীকে জটিলতর করেছে।

(গ) অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে নুটু মোক্তারের সংগ্রামকে নিয়ে গল্পটি গড়ে উঠেছিল। নাটকে সেক্ষেত্রে নতুন সংযোজন পিতাপুত্রের বিরোধ তথা প্রাচীন কালের সঙ্গে নবীন কালের দ্বন্দ্ব। প্রাচীন ও নবীনের সংঘাত তারাশংকরের সাহিত্যের একটি প্রধান বিষয়। 'দুই পুরুষ' নাটকেও এই বিষয় প্রযুক্ত হয়েছে। গল্পে এই সূত্রটি ছিল না। সুতরাং থীমের দিক থেকেও গল্প থেকে নাটকটি অনেকটা সরে এসেছে।

(ঘ) থীমের এই পরিবর্তন নাটকের পরিণতিকেও ভিন্নতর করেছে। গল্পের পরিণতি ছিল সংকেতগর্ভ। যে ধনী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নুটুবিহারী আজীবন সংগ্রাম করেছেন শেষ পর্যন্ত তিনি সেই সম্প্রদায়ভুক্তই হলেন। নুটুবিহারীর এই পতনেই

গল্পের সমাপ্তি। বৃদ্ধ মুন্সেফবাবুর চিঠি পড়ে হঠাৎ নুটুবিহারীর চেতনা জাগ্রত হ'লো। ঐশ্বর্য্য ও আভিজাত্যের কারাগারে তিনি বন্দী। সেখান থেকে বেরোতে চাইলেন। কিন্তু 'কই, দরজা কই?' ছোটগল্পের এরকম সাংকেতিক পরিসমাপ্তিই প্রত্যাশিত।

নাটক বলেই 'দুই পুরুষে'র পরিণতি এমন ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ নয়, তাতে অশেষের ব্যঞ্জনা নেই। সেখানে নুটুবিহারী সুশোভন, কল্যাণী ও মমতাকে বিতাড়িত ক'রে এবং পুত্রের সঙ্গে জমিদারের নাতনীর বিয়ের সম্বন্ধ ক'রে যে পতনের দিকে যাত্রা শুরু করেছিলেন শেষ পর্যন্ত তা রুখতে পেরেছেন। গল্পের শেষ হয়েছিল নুটুবিহারীর পতনে, নাটকের সমাপ্তি ঘটল তাঁর উত্থানে। বিদ্রোহী পুত্রকে আশীর্বাদ ক'রে, নতুন কালকে স্বাগত জানিয়ে, পত্নী বিমলাকে সর্বস্ব সমর্পণ ক'রে নুটুবিহারীর মুক্তি ঘটল। নাটকের এই পরিণতি মেজাজের দিক থেকে গল্পের সমাপ্তি থেকে স্বভাবতই আলাদা।

(৬) 'নুটু মোক্তারের সওয়াল' গল্পে কালের যাত্রা যুক্ত হয়নি। কোন্ সময়ের গল্প তা বোঝার উপায় নেই। আন্দাজে বোঝা যায় গল্পটি এমন সময়ের যখন জমিদারদের প্রতাপ ছিল প্রচণ্ড। পক্ষান্তরে 'দুই পুরুষ' নাটকে কালের স্বাক্ষর স্পষ্টরেখায় মুদ্রিত। নাটকটির ঘটনাকাল বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক (১৯২২ সালের কাছাকাছি)। ভারতের রাজনীতিতে তখন নূতন কালের সূচনা ঘটেছে গান্ধীজীর সক্রিয় ভূমিকায়। বরদলৈ আন্দোলনকে কেন্দ্র ক'রে ভারতবাসীর চিত্তে আশা জেগেছিল। গান্ধীজী রাজনীতির সঙ্গে আদর্শকে যুক্ত করেছিলেন। 'দুই পুরুষে'-র নুটুবিহারীকেও দেখি আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতারূপে। স্বাদেশিকতার মন্ত্রে সে উদ্বুদ্ধ, কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও আদর্শনিষ্ঠ। পরে অবশ্য তার পরিবর্তন ঘটেছে।

১৯৪২ সালে লেখা এই নাটকে সমকালীন রাজনীতি সম্পর্কে বিক্ষিপ্ত কিছু মন্তব্য ছড়িয়ে আছে। চরিত্রাঙ্কনেও সমকালীন রাজনীতির কিছুটা প্রভাব দেখা যায়। বারে বারেই কৃষক বিদ্রোহের প্রসঙ্গ এসেছে। মহাভারতের মধ্যে সেই বিদ্রোহের উন্মাদনা আছে। অরুণকে 'কমরেড' বলার মধ্যে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইশারা আছে। 'দুই পুরুষ' রচনাকালে তারাশংকর বামপন্থী রাজনীতির প্রতি অনুরাগশীল হ'য়ে ওঠেন। এর কিছুকাল পরই তিনি ফ্যাসি-বিরোধী সাহিত্যিক ও শিল্পী সংঘের ঘনিষ্ঠ হন। এ সম্পর্কে আত্মকথায় লিখেছেন, "সেদিন আমি ফ্যাসিবিরোধী সাহিত্যিক ও শিল্পী-সংঘের সমাদরে সমারোহে নিশ্চয়ই অনেকটা আচ্ছন্ন হয়েছিলাম বই কি! সেদিন তাঁদের কাছে পেয়েছি অনেক, এবং এই পাওয়ার জন্যই প্রীতিবশত সেদিন আমার কল্পনার সাম্যবাদী কর্মীকে তাঁদের দলের কর্মী হিসাবে কল্পনা করেছিলাম।"[১০] 'দুই পুরুষে'-র কেন্দ্রীয় চরিত্র নুটুবিহারী কংগ্রেস-বিরোধী দলের হ'য়ে আইন-সভার সদস্য হয়েছিলেন।

(চ) গল্পের নাট্য-রূপান্তরে চরিত্রও রূপান্তরিত হয়েছে। চরিত্র-প্রধান গল্প বলেই 'নুটু মোক্তারের সওয়ালে' নুটুবিহারীর চরিত্রকে নানাভাবে আলোকিত করা হয়েছে। সেখানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন নুটুবিহারীকেই মূলত দেখতে পাই। নাটকে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্বাদেশিকতার চেতনা। গল্পে নুটুবিহারীর অন্তরঙ্গ সত্তার কোনো পরিচয় নেই। নাটকে কল্যাণী ও বিমলাকে নিয়ে নুটু-বিহারীর অন্তরঙ্গ সত্তার জটিলতা উদ্ভাসিত। গল্পে নুটুবিহারীর স্ত্রী নাটকে শুধু বিমলা নামই পায় নি, স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে কল্যাণীকে নিয়ে কিছুটা মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাও দানা বেঁধেছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য নুটুবিহারী বিমলার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন।

(ছ) গল্পের নামে সওয়ালের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। 'পিতাপুত্র' নামকরণে সে নাম পাল্টে গেল। 'দুই পুরুষ' নামে উৎসমূল থেকে নাটকটি আরো দূরে সরে

গেল। নুটুবিহারী নাটকে পরিবর্তিত হয়েছে অতি দ্রুত। যেহেতু গল্পের কথা তারাশংকরের মনে ছিল সেই হেতু তিনি 'সওয়ালে'-র দিকে লক্ষ রেখেছিলেন। দেশব্রত ও ত্যাগব্রত থেকে একটি মানুষ প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠেছে — নাটকের আবেদন যেন সেইখানে। 'সওয়াল' নিশ্চয়ই দেশব্রতের সঙ্গে অন্বিত হতে পারে। কিন্তু নাটকে যেভাবে 'সওয়াল'-কে উপস্থিত করা হয়েছে তাতে 'সওয়াল' ব্যক্তি-কেন্দ্রিক হ'য়ে উঠেছে এবং নুটুবিহারীর ব্যক্তি-কেন্দ্রিক সওয়ালটিই পরিণামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

গল্পের নাটকে রূপান্তরে এই যে পরিবর্তনগুলি ঘটল তাতে নাটক হিসেবে 'দুই পুরুষ' কতটা সার্থক হ'ল তা-ই দ্রষ্টব্য।

(চার)

তারাশংকর লিখেছেন – , "নাটকে অবান্তরের স্থান নেই ; যা সামগ্রিক তাৎপর্যের সঙ্গে সম্বন্ধরহিত কিংবা নাটককে তার পরিণতির দিকে এগিয়ে দিচ্ছে না নাট্যসাহিত্যে তা-ই অবান্তর।" [১১]

তারাশংকরের এই নাট্যবোধ প্রতিফলিত 'দুই পুরুষে'-র গঠনসৌকর্যে। এর বুনুনি নিখুঁত। প্রতিটি ঘটনা, পরিস্থিতি, চরিত্র ও সংলাপ রচনায় তারাশংকর অত্যন্ত সতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন। 'কবি' ও 'আরোগ্য নিকেতন' নাটক দু'টিতেও এমনটা দেখা গিয়েছিল।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীনতা ও অত্যাচারের প্রতিবিধানে দৃঢ়সংকল্প নুটুবিহারী জমিদার শিবনারায়ণ-দেবনারায়ণের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হন। নুটুবিহারীর

বিজয়ে সেই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। এরপর কল্যাণী, মমতা ও সুশোভনের বিতাড়ন এবং আদর্শের ক্ষেত্রে পিতাপুত্রের বিরোধে নাটকে নতুন দ্বন্দ্বের সূচনা। এই দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত নাট্যগতি অক্ষুণ্ণ রাখে। তবে নাটকে এই দ্বন্দ্বের বিস্তার নেই।

চরিত্রাঙ্কনে তারাশংকর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। নুটুবিহারীর চরিত্র সু-অঙ্কিত। কিন্তু কল্যাণীকে কেন্দ্র ক'রে তাঁর চরিত্রে দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কল্যাণীর দাদা সম্বোধনে নুটুবিহারীর প্রেমের বন্ধনমুক্তি অতিসরলীকৃত বলে মনে হয়। বিমলাকে নিয়ে নুটুবিহারীর মধ্যে অশান্তির দাহ দেখানো হয়েছে, কিন্তু সমস্যা জট পাকাবার আগেই বিমলা সেই সমস্যার গ্রন্থি-মোচন করেছে। নুটুবিহারী সমস্যার মুখোমুখি হ'য়ে বিচলিত হননি। ফলে নুটুবিহারীর অস্থিরতা নাটকে যতটা প্রকাশিত হয়েছে ততটা গভীর কোন যন্ত্রণা ফুটে ওঠেনি। কল্যাণীর প্রতি নুটু কোন অপ্রাপ্তিই অনুভব করেননি।

বিমলা চরিত্রটি খানিকটা জটিল। নুটুবিহারীর আদর্শের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু বাইরে থেকে বোঝার উপায় ছিল না। স্বামী তাঁকে আজীবন উপেক্ষা করেছেন। তাঁর হৃদয়ে বেদনার এক গোপন ক্ষতচিহ্ন বিদ্যমান। সুদীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে স্বামীর প্রেম-বঞ্চিতা তিনি। কল্যাণীর সঙ্গে তাঁর স্বামীর অতীত সম্পর্ক নিয়েও তাঁর মনে খানিকটা জটিলতা ছিল। পরে অবশ্য তা কেটে গিয়েছিল। বরং স্বামী যেখানে মোহগ্রস্ত, বিমলা সেখানে মুক্ত-দৃষ্টি। উপসংহারে নুটুবিহারীর ক্ষমা-প্রার্থনায় তাঁর বেদনার কিছুটা লাঘব ঘটেছে।

সেকালের বিক্ষিপ্ত কৃষক-বিদ্রোহের কিছু ছাপ পড়েছে মহাভারতের চরিত্রায়নে। বস্তুত তাকে উপলক্ষ করেই জমিদারদের সঙ্গে নুটুবিহারীর দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। প্রবল প্রতিশোধস্পৃহাই তার চরিত্রের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য। ভীতির কাছে সে মাথা নত করেনি, প্রলোভন সে জয় করেছে। নুটুবিহারী যখন তাঁর পুত্রের সঙ্গে জমিদার শিবনারায়ণের

পৌত্রীর বিয়ে স্থির করেন তখন মর্মাহত মহাভারত নুটুবিহারীকে ছেড়ে যায়। এই ছেড়ে যাওয়া নুটুবিহারীর সত্যোপলব্ধিতে সাহায্য করে।

শিবনারায়ণ সেকালের জমিদারদের প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র। নুটুবিহারী ও মহাভারতের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য যে-সব স্থূল ও সূক্ষ্ম উপায় উদ্ভাবন করেন তিনি, তার বাস্তবতা অনস্বীকার্য। বিশ্বস্ত পুরাতন ভৃত্য কালী বাব্দীর প্রতি মমতা চরিত্রটিকে নতুন রঙে রাঙিয়েছে। প্রাচীন ও নবীন জমিদারের মানসিকতা ও চরিত্রের পার্থক্য শিবনারায়ণ ও দেবনারায়ণের মধ্য দিয়ে দেখানো হয়েছে। এ-নাটকে জমিদারদের প্রতি নাট্যকারের মনোভাব অত্যন্ত কঠিন। কোনো মোহ নেই তাঁর।

"গোপীনাথ মিত্তির সম্ভবত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ গোমস্তা চরিত্র।"[১২] শঠতায়, প্রলোভনে, চাটুকারিতায় গোপীনাথ এক আকর্ষণীয় নাটকীয় চরিত্র। এমনি আকর্ষণীয় চরিত্র উদারচিত্ত, স্নেহকাতর, শিল্পী সুশোভন।

অরুণ নুটুবিহারীর আদর্শের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। নাটকের শেষে নুটু যখন মোহগ্রস্ত, আদর্শভ্রষ্ট তখন অরুণ তাঁকে আদর্শের পথে নিয়ে আসতে সচেষ্ট হয়েছে। তবে অরুণের মধ্যে রক্ত-মাংসের উত্তাপ কম, সে অনেকটাই আদর্শের ধ্রুবলোকের চরিত্র। এমনিতর চরিত্র তারাশংকরের লেখায় বারবার এসেছে (অহীন, শিবনাথ, দেবু প্রমুখ)।

সংলাপ রচনায় এ নাটকে তারাশংকর মোটামুটি সফল। রবীন্দ্রনাথের গানে নাটকের সূচনা। কল্যাণীর কণ্ঠে গীত 'হে ভুবনেশ্বর' গানটির রচয়িতা সজনীকান্ত দাস। অন্য গানগুলি লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। এককথায়, গানগুলি সুপ্রযুক্ত।

'দুই পুরুষ' নাটক ও তার অভিনয় তথা মঞ্চসাফল্য জনমানসে প্রবল আলোড়ন তুলেছিল। অমৃতবাজার পত্রিকার নাট্য-সমালোচক লিখেছিলেন —

"The intrinsic depth and scope of this social drama rings clear and true in every mind with its utter humanity and beauty ..... the play presents itself as a perfect specimen of a neat drama, masterfully woven by a magic hand, neatly executed with finished touches of productional finesse, and re-created by a nicely co-ordinated band of artistes." [১৩]

॥ উল্লেখপঞ্জী ॥

১। Graham Balfour — Life of Stevenson, P. - 169.

২। সমারসেট মম্ — The Summing up (Mentor Book Edition), 1961. P. - 130.

৩। তারাশংকর — আমার সাহিত্য-জীবন — ১ম পর্ব — পৃঃ - ১০১ (বৈশাখ, ১৩৭৬)।

৪। রবিন পাল — তারাশংকর ও তাঁর গল্প — তারাশংকর : দেশ কাল সাহিত্য — ডঃ উজ্জ্বল কুমার মজুমদার সম্পাদিত — (চৈত্র, ১৩৮৪) পৃঃ - ১১৭।

৫। তারাশংকর — আমার সাহিত্য-জীবন — ২য় পর্ব — পৃঃ - ৭৩ (ভাদ্র, ১৩৭৩)।

৬। তারাশংকর — ভূমিকা — 'দুই পুরুষ' (আষাঢ়, ১৩৪১)।

৭। তারাশংকর-রচনাবলী — দ্বাবিংশ খণ্ড — (বৈশাখ, ১৩৯৩) — গ্রন্থ-পরিচয় — চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ - ৪৫৪।

৮। দেবনারায়ণ গুপ্ত — মণ্চজগতের আপনজন তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর স্মৃতি সংখ্যা, কালি ও কলম, অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮, পৃঃ - ৬৫০।

৯। তারাশংকর — আমার সাহিত্য-জীবন (২য় পর্ব) — পৃঃ — ১১১ / ২০ (ভাদ্র, ১৩৭৩)।

১০। তদেব

১১। তারাশংকর — আধুনিক বাংলা নাট্যসাহিত্য : সাহিত্যের সত্য — পৃঃ - ৬০।

১২। মানস মজুমদার — নাট্যকার তারাশঙ্কর : পৃঃ - ১২ (জানুয়ারি, ১৯৭৭)।

১৩। Amrita Bazar Patrika, June 28, 1942, P. - 10.

'নুটু মোক্তারের সওয়াল' গল্পের উদ্ধৃতিগুলি তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (দ্বিতীয় খন্ড), সম্পাদনা — জগদীশ ভট্টাচার্য, — ১৯৮৫ থেকে গৃহীত।